প্রকাশ কর্মকারের সেইসব ল্যান্ডস্কেপ

কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত

এই সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্পী প্রকাশ কর্মকার চলে গেলেন অতি সম্প্রতি। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও কোথাও সেভাবে তাঁর কাজ নিয়ে আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে না। চিত্রপ্রেমীদের কাছে এ বড়ো দুঃখের ঘটনা। অথচ প্রকাশ কর্মকার কোনওদিনই প্রান্তবাসী শিল্পী ছিলেন না। তিনি জীবন কাটিয়েছেন বলা যায় ঘটনার ঘনঘটার মধ্যে দিয়ে। জীবদ্দশায় তিনি এমন অনেক কাজই করেছেন যা সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এসেছে। আজ প্রকাশ আমাদের মধ্যে নেই, এখন সময় তাঁর কাজের মূল্যায়ণ করার।

প্রকাশের জন্মসাল নিয়ে কিঞ্চিৎ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও মোটামুটি ১৯৩৪ সালটিকে তাঁর জন্মবছর বলে মানা হয়। প্রকাশের বাবা প্রহ্লাদচন্দ্র কর্মকার ছিলেন খুবই নামকরা চিত্রশিল্পী। যদিও প্রকাশ তাঁর বাবাকে কাছে পেয়েছেন খুব অল্পসময়ের জন্য। প্রকাশ যখন বারো বছরের কিশোর তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। প্রকাশের ছবিতে যে ক্ষয়, ক্রোধ ও ব্যাঙ্গের কাটাকুটি খেলা তার উৎসভূমি নিঃসন্দেহে তাঁর ক্ষতবিক্ষত শৈশবের স্মৃতি। বাবার অকালমৃত্যু, সংসারে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুনে বাবার ছবি আঁকার স্টুডিওর ধ্বংস, কৈশোরেই আততায়ীর হাতে ছুরিবিদ্ধ হওয়া, মায়ের মৃত্যু, মাত্র ষোল-সতের বছর বয়সেই জীবিকার সন্ধানে নেমে একের পর এক চমকে দেবার মতো অভিজ্ঞতা প্রকাশের শিল্পীসত্ত্বাকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলেছিল। সম্ভবত এই জন্যই তাঁর ছবিতে রেখার এত কর্কশতা, রঙের এত উচ্চকিত প্রবাহ। সামাজিক ক্ষয় ও মানসিক ভণ্ডামির অভিজ্ঞতা প্রকাশকে করে তুলেছিল প্রতিবাদী। এক হিসেবে তাঁকে যেন মনে হয় বাংলার পল গগাঁ। যদিও গগাঁর মতো তিনি সভ্যতা থেকে নিজেকে নিয়ে যাননি স্বেচ্ছা নির্বাসনে। তবুও জীবনাচরণের ভঙ্গিমায়, চিন্তারদর্শনে তাঁর সঙ্গে গগাঁর কোথায় যেন একটা মিল দেখা যায়। তিনি আসলে এক আদিম শিল্পী যে কিনা রঙে তুলি ডুবিয়ে নিলে আর কাউকে পরোয়া করেন না। নয়নসুখ ছবি আঁকায় প্রগাঢ় আপত্তি ছিল প্রকাশের। অথচ এ প্রকাশই ক্রমে জীবনের প্রান্তবেলায় এসে উপনীত হয়েছিলেন এক ভিন্নমেজাজের চিত্রবোধে। যে বোধ

থেকে জন্ম নিয়েছিল তাঁর একের পর এক নিসর্গচিত্রগুলি। বাংলার আর কোনও শিল্পী তাঁর মতো করে এদেশের গাছ পুকুর মাটি আকাশ ও জলবায়ুকে আঁকেননি কখনও।

চাকরিসূত্রে দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন শিল্পী। বৈদ্যনাথ আয়ুর্বেদ কোম্পানির প্রধান শিল্পী হিসেবে ১৯৭০ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি থেকেছেন এলাহাবাদের কাছে নৈনিতে। অবশ্য কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট করেননি তিনি কোনওদিন। চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে আশির দশকের একেবারে শেষে তিনি চলে আসেন বালির কাছে রামচন্দ্রপুরের সাহেববাগানে। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ, প্রকৃতি যেখানে অনেকটাই উদারহস্ত অন্তত এক শিল্পীর জন্য। এখানে আসার পর প্রকাশের ছবিতে, বিশেষ করে তাঁর নিসর্গচিত্রে ফুটে ওঠে এক আশ্চর্য পালাবদল। এতদিন যাঁর নন্দনভাবনায় প্রাধান্য পেত ক্ষয়ের দর্শন, ভাঙনের তীব্র আওয়াজ, রেখা ও রঙের কৌতুকময় নাটকীয়তা আর বিষয়ের বিক্ষোভ, অবশেষে সেই শিল্পী যেন আত্মস্থ হলেন প্রকৃতির অন্তর্লোকে। অবশ্য এর মানে কিন্তু এই নয় যে প্রকাশ জীবন থেকে পালাবার জন্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করেছিলেন। তাঁর ছবির প্রকৃতি হল জীবনেরই আর এক নির্মাণ। প্রকাশের ল্যান্ডস্কেপগুলির কেন্দ্রে প্রায় সময়েই আমরা দেখি কোনও একটি গাছ, দেখি তার তীব্র কর্কশ শিকড়গুলি। মাটির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে তারা, যেন খামচে আদায় করে নিতে চায় জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদটুকু। বেশিরভাগ সময়েই প্রকাশের পছন্দ হত খেজুরগাছের বাঁকানো ভঙ্গিমাটি। সে সমুদ্রপাড়ে নোনাবালির পাশেই হোক কিংবা শান্ত জোৎস্নার বিছানায় জেগে থাকা সুশীতল ঘাসের ওপর, যেভাবে হোক খেজুর গাছটিকে বারবার এঁকেছেন তিনি। কাঁটাময় শরীরটি তার, পাতাগুলিও বড়ো বেশি উচ্চকিত, তীক্ষ্ণ। তবু সে খেজুর গাছের গলায় ঝোলে রসের হাঁড়ি, কখনও সখনও রঙিন পাখিটিও এসে বসে তার কন্টকিত শরীরে। আর নেপথ্যে থাকে বিচিত্ররঙের আকাশ, কেপে ওঠা দিগন্তরেখা, বাউলের আলখাল্লার মতো

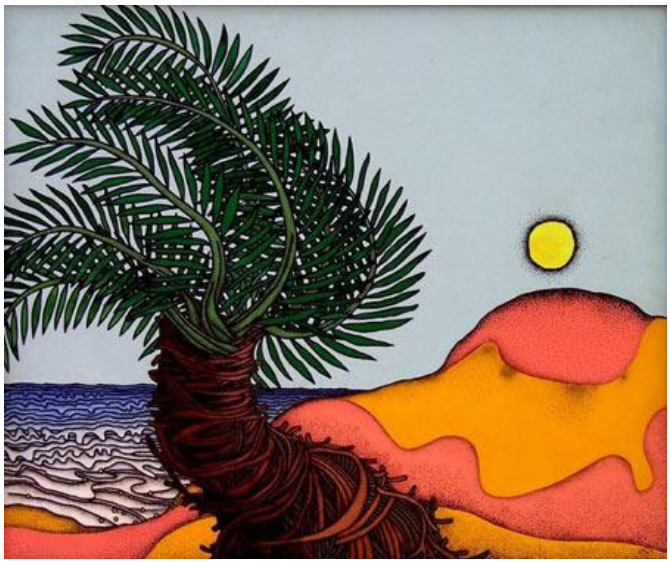

শতরঙের জমি। শান্ত একটি পুকুরও থাকে ছবিতে। হয়তো সে পুকুরে সূর্য এসে স্নান করে জুরায় তার দহনজ্বালা। প্রকাশের ল্যান্ডস্কেপ কখনওই নয় আলোকচিত্র সদৃশ। প্রকাশ যে কোনও সৎ-আধুনিক শিল্পীর মতোই প্রকৃতির হুবহু অনুকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বলতেন, 'অভ্যস্ত অবস্থানের ফর্ম ভেঙে আমি বিকৃত করি। কেননা বিকৃত যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ তো সে ছবি হচ্ছে না।' ভাঙন বা বিকৃতি না এলে জীবনও তো সম্পূর্ণ হয় না মানুষের।

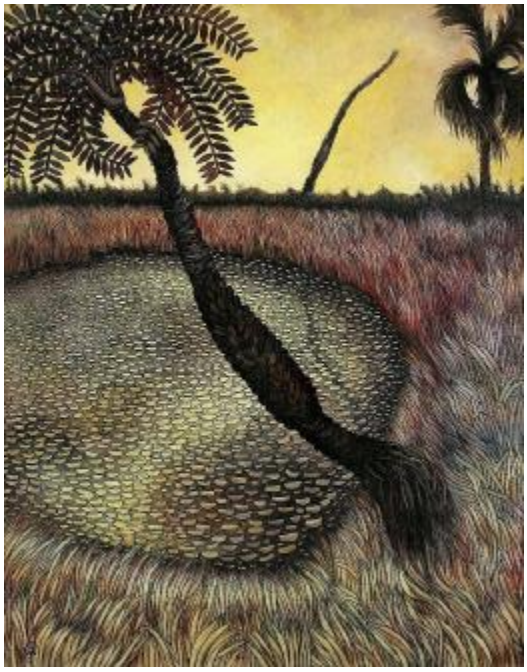

কৈশোরেই প্রকাশ চিনেছিলেন ভাঙনকে। জীবনের পড়ন্তবেলায় সেই স্মৃতিই কি তিনি খুঁজতেন বাঁকানো খেজুরগাছের মধ্যে? প্রখর তাপে পুড়ে গিয়ে তেষ্টা মেটানোর জন্যই কি তিনি বারেবারে আঁকতেন একের পর এক পুকুর, ডোবা? অথবা ক্লান্তি জুড়োনোর জন্য সূর্যের বিপ্রতীপে ঘাসের নরম বিছানা? তবে কি শেষবয়সের শিল্পীর মানসলোকে আশ্রয়ের আকাঙ্খাটুকুই চালিত ও প্রাণিত করেছিল তাঁকে? তা নাহলে কেনই বা তিনি এমন সব আশ্চর্য নিঃসর্গের জন্ম দিলেন ক্যানভাসে?

লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঝড় সাহিত্যপত্র ৭ - ১৩ এপ্রিল ২০১৪ সংখ্যায়